Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 529 – 536
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

প্রবন্ধের ভুবন ও রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি চিন্তা

অশোক দাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর
Email ID : ashokdasau@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Ideology, Thought, Subject, Aesthetic, Culture, Literature, Education, Bankim Chandra, Biharihal, Vidyasagar Charit, Aadhunik Sahitya.

Abstract
It is an established fact that Rabindranath is not only a Philosopher of high stature but a Social philosopher as well. But the Purpose of this Paper is not a to establish tries to focus on some aspects of Tagore Society. Education and culture thinking from when we shall ultimately be able to derive a picture of his ideal Society. The object of the Paper is to analyze the Society and education thoughts of Tagore his basic conception of society and education culture and its process. The paper primarily based on Secondary sources Like Rabindra Books and Articles etc. He believe that education should help and individual to attain complete manhood, so that all his powers may be developed to the fullest extent for his own Individual Perfection. Rabindranath also believed that the education & Culture of a country a acquires shape and substance only against the entire background and it is important there is a Strong relationship between education & Society.

Discussion
রবীন্দ্র আলোচনা কিংবা সমালোচনার একটি বিস্তর বাধা সবদিনই বিদ্যমান। কারণ যে তিনি নিজেই সহজ কথাকে সহজভাবে পাঠকের দরবারে পৌঁছাতে গিয়ে পাঠকের উপলব্ধির জগতকে কত সহজভাবে ছোঁয়া যেতে পারে – তার প্রয়াস দেখি কবির লেখনিতে সর্বত্র। পাঠকের বোধের ফাঁকটিকে কবি কিংবা প্রাবন্ধিক সবদিনই চেয়েছেন ভরাট করতে। আর তার জন্য কবির প্রয়াসের কোনো কমতি হয়নি। সাহিত্য নামক আঙ্গিকের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কবি রবীন্দ্র ঠাকুরের লেখনি পৌঁছায়নি। তাই তাঁর লেখায় সবকিছুরই প্রতিফলন ঘটেছে বিস্তর। অনেকেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথ সব থেকে স্বচ্ছন্দ প্রকাশ করতেন প্রবন্ধ। আবার অনেকেই কবির প্রবন্ধাবলীকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন -

> "অশীতি পেরোনো বছরের সুদীর্ঘ জীবনে এবং কিঞ্চিদধিক পঞ্চষষ্টি বছরের সাহিত্য জীবনে নিজেকে তিনি বারবার কবি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যদিও তাঁর প্রতিভার অন্যতম কষ্টিপাথর —'গদ্যং কবীনাং নিকষং – বদন্তি'। রবীন্দ্র-প্রবন্ধ তার কাব্যেতর বাহনগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতেই পারে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন তখন তাঁর কাছে ঠিক বাংলা প্রবন্ধের আদল তেমন করে সুচারু ও সুস্পষ্ট ছিল না। অর্থাৎ ধ্রুব আদর্শ' ছিল না। তবে ঠাকুর পরিবারের পত্র-পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল নিবিড়। বরং সমকালের প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলোই তাঁর প্রবন্ধাবলীর মানসিক ভিত্তিগুলো তৈরি করে দিয়েছিল। কবি নিজে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার লেখালেখির কথা বহুবার উল্লেখ করেছিলেন। অধিকন্তু, 'তত্ত্ববোধিনী', 'অবোধত্ব', 'আর্যদর্শন', 'ভারতী' নানা পত্র-পত্রিকায় বস্তু ও বিষয়নিষ্ঠ নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের- প্রথম জীবনের প্রবন্ধ রচনার আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্পর্কেও সমালোচক জানিয়েছেন -

> "রবীন্দ্র জীবনীকার-কর্তৃক সংগৃহিত তথ্য থেকে জানা যায় যে বাল্যে হিমালয় ভ্রমণকালে পিতৃপ্রদত্ত শিক্ষার গুণে তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত যে সব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, তার কিছু কিছু তিনি লেখেন, যা আক্ষরিত অবস্থায় তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল। বিলেত যাবার আগে বোম্বাই প্রদেশে অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের গৃহে অবস্থানকালে ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে কিছু প্রবন্ধ রূপান্তরিত হয়। সুতরাং তৎকালে পরিচিত বিশিষ্ট ইংরেজি প্রবন্ধকারদের প্রচলিত ও পাঠ্য প্রবন্ধ এবং বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত তৎকালীন বাংলা প্রবন্ধ জাতীয় রচনা প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের মানসলোক গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।"[২]

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের বিস্তর আলোচনায় তাঁর প্রবন্ধ সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো একটি একক সিদ্ধান্তে আসা সহজ কিংবা অনায়াসলভ্য নয়। কারণ বারে বারেই কবি তাঁর নিজের ঐতিহ্য, ভাবনা ও প্রতিভার স্বভাব- ধর্মকে ভাঙেন কেননা 'লহরে লহরে নূতন নূতন অর্ঘ্যের অঞ্জলি'[৩] এটাই যেন কবি ঘোষণা করে এসেছেন। আজীবন নিজের হাতে গড়ে তোলা সংস্কারকে কবি নিজেই যেন চূর্ণ করে গড়ে তুলেছেন এক নতুন সংস্কার। আর এভাবেই কবি নতুন করে নিজেকে নির্মাণ করে নেন। গড়ে তোলেন এক নিজস্ব স্টাইল। তাঁর প্রবন্ধাবলীতে কেবলমাত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাসভাবনার আবেগই শুধু নয়, বাস্তব ও গুরুগম্ভীর বিষয়ই এসে ভিড় করেছে। প্রবন্ধ মাত্রেই বিষয় নির্ভর, বিষয় সর্বস্ব ফলে প্রাবন্ধিকের রচনায় বিষয়ের দাবিকে অস্বীকার করা সহজ নয়। তবে সাধারণ পাঠকের কাছে তার নিবন্ধের বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট না হলেও একেবারে যে বিষয় উদাসীন তা একেবারেই নয়। রবীন্দ্র প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়কে বহু ধারায় বিভাজিত করা যায়। মোটামুটি ভাবে সমাজ-সাহিত্য-রাজনীতি-ভাষাতত্ত্ব-চরিত-দর্শন-ধর্ম-ইতিহাস এভাবে মূলত এগুলোকে বিভাজিত করা সম্ভব। আবার অনেক সময় দেখা গেছে রবীন্দ্র প্রবন্ধের বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের সীমারেখাকে খুব সুস্পষ্ট ভাবে রেখায়িত করাও সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্র প্রবন্ধের বিভাজন নিয়েও সমস্যা আছে অনেক বিস্তর। গতানুগতিকতার স্থান রবীন্দ্রভাবনায় কোনদিনই আসেনি। বলা যায় রবীন্দ্রনাথ সবদিনই গতানুগতিকতার বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে সমকালীন তথাকথিত একমুখী বিষয়চারিতা থেকে ছিলেন পুরোপুরি আলাদা। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন তাঁর ভাবনার এরকম কিছু কথা -

> "গদ্য লেখাটাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো, স্বীকার করতে শিখিনি। যখন আমাদের পণ্ডিতমশাইরা কাদম্বরীর রীতিতে গদ্য লিখতেন তখন আর যাই হোক এটা জানতেন যে লেখাটা একটা চাষের ফসল, ওটা আগাছা নয়।"[৪]

লেখক গদ্য লেখাটাকে একটা বিশেষ রচনা বলে যে মর্যাদা দিতে চান- তা তাঁর লেখায় স্পষ্ট আভাসিত হয়েছে। একেবারে তরুণ বয়স থেকে গদ্য লেখার প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটি গভীর শ্রদ্ধা ও ভাবনা বজায় ছিল, বলেই হয়তো তাঁর লেখায় গুরুত্বের প্রকাশ দেখি অধিক। কারণ প্রকাশই কবিত্ব এই ভাবনায় বিশ্বাসী যিনি, তাকে তো সর্বদা স্বতন্ত্র হতে দেখা গেছে। অনেকে মনে করেন জ্ঞান বিজ্ঞানের যে সাহিত্য কিংবা সাহিত্যরস বলতে যা বুঝি, ঠিক সে ধরনের নয় রবীন্দ্রসাহিত্য। তাঁর নিবন্ধগুলোতে মূলত আশ্রয় করেছে জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা জীবনবোধ। অনুভূতির এক গভীর নিবিড়তা থেকে উৎসারিত ভাবনা, সঙ্গে কল্পনার আধিক্য যুক্ত হয়ে রবীন্দ্র নিবন্ধগুলো গদ্যের প্রয়োজনীয়

গতি অতিক্রম করে গদ্য শিল্প হয়ে উঠেছে। তাঁর নিবন্ধের বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতা পড়তে গিয়ে আমাদেরকে বারংবার ভাবিত করেছে -

> "পাগল তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাজুখ না হয়। সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রবি করোদ্দীপ্ত তৃতীয় নেত্র ধ্রুব জ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। নৃত্য করো হে উন্মাদ, নৃত্য করো। সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমান হইতে থাকিবে — তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্র সংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।"[৫]

কিংবা

> "আমার সমুখ দিয়া কত লোক আসে, কত লোক যায়। প্রভাতের আলো তাহাদের আশীর্বাদ করিতেছে। স্নেহভরে বলিতেছে। তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। পাখিরা কল্যাণ গান করিতেছে। পথের আশে পাশে ফুটফুট ফুলেরা আশার মতো ফুটিয়া উঠিতেছে। যাত্রা আরম্ভের সময়ে সকলে বলিতেছে ভয় নাই ভয় নাই। প্রভাতে সমস্ত বিশ্বজগত শুভযাত্রার গান গাহিতেছে। অনন্ত নীলিমার উপর দিয়া সূর্যের জ্যোতির্ময় রথ ছুটিয়াছে।"[৬]

দেখা যাচ্ছে, দুটো ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ বিস্তর প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কোথাও ধ্বনি সৌন্দর্যের পাশাপাশি - ভাবগাম্ভীর্য, আবার সতেজ সুন্দর গদ্য ব্যবহারে লেখকের তুলনা সত্যিকার অর্থেই বিরল। সবকিছুর উপরে উঠে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। 'প্রাচীন সাহিত্য', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'পথের সঞ্চয়', 'সংগীত চিন্তা', 'কালান্তর' — ইত্যাদি নিবন্ধমালা যেন লেখকের স্বকীয় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত। বিষয় ও বিষয়ীর অতি আশ্চর্য মেলবন্ধনে হয়েছে উদ্ভাসিত। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ প্রথাগত ভাবনা ও ভাবধারার বিরোধিতা করে সাহিত্য-সমালোচনামূলক আরোও বেশকিছু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন – যা সাহিত্য আলোচনায় নতুনমাত্রা সংযুক্ত করেছিলো। বাঙালি দু চোখ ভরে শিখতে ও জানতে পেরেছিলো একজন প্রকৃত প্রাবন্ধিকের কাছে আমরা কতই না কিছু আশা করতেই পারি। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনা ও বোধের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে জনৈক সমালোচক জানিয়েছেন -

> "রবীন্দ্রনাথই উনিশ শতকের শেষে এই প্রবণতার বিরোধিতা করে সাহিত্য-সমালোচনায় নতুন সৃষ্টিশীল পর্যায়ের সূত্রপাত করেন। 'সমালোচনা', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেছেন, সমালোচনা ও সৃজনাত্মক মননের শক্তিতে সার্থক শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে।"[৭]

একাধিকবার এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যেখানে জীবন ও সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছেন। জীবনের অভাব সাহিত্য যে পূরণ করে তা তাঁর লেখালেখিতে বারবার সম্পূর্ণতা পেয়েছে। বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা একটি চিঠিতে যে ভাবনা ও মন্তব্য করেছেন তাতে তাঁর আগ্রহ অগ্রগতির পথটিকে সহজে কিনে নিতে পারি- 'জীবনের অভাব সাহিত্য পূরণ করে। চির মনুষ্যের সঙ্গ লাভ করে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্ব অলক্ষিতভাবে ঘটিত হয় – আমরা চিন্তা করতে, ভালোবাসতে, এবং কাজ করতে শিখি। ...সাধারণত দেখলে বিজ্ঞান-দর্শন ব্যতীত ও কেবল সাহিত্যে একজন মানুষ তৈরি হতে পারে, কিন্তু সাহিত্য ব্যতিরেকে কেবল বিজ্ঞান দর্শনে মানুষ গঠিত হতে পারে না।' মনুষ্যত্বের চাষ ও মানবধর্মের পূজারী রবীন্দ্রনাথ আজীবন মানবজীবনেরই কথা বলেছেন, সে পথেই তাঁকে হাঁটতে দেখা গেছে এভাবে তাকে এগোতে হয়েছে আজীবন। তবে রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্দেশ্যের মুখতা কেবল জ্ঞানের ভাব উল্লেখ নয়, বরং-

> "জ্ঞানের সাহিত্য বলতে যা বুঝায় রবীন্দ্র-প্রবন্ধ সাহিত্য ঠিক সে ধরনের নয়, তাঁর প্রবন্ধের চিন্তা-মূলকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তি, জীবনবোধ-সঞ্জাত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির নিবিড়তা। মনন-মনীষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সহৃদয় প্রাণোত্তাপ; আর তাকে পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত করে দেবার জন্য কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপমা-অনুপ্রাস সৃষ্টির প্রাচুর্য তথা, 'সাজ-সরঞ্জাম' বা কলাকৌশল, যার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি।"[৮]

সুন্দর থেকে সুন্দরতম জীবনের অন্বেষণ ও মানবধর্মের পুজারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিবন্ধমালায় অসাধারণ চিন্তা-ভাবনা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার যে পরিচয় রেখেছেন তা সত্যিকার অর্থেই বিরল। নিছক ভাবনার সঙ্গে ভাবনাকে জড়িয়ে নিয়ে কথার মালা যে লিখেননি প্রাবন্ধিক, তা তার বিপুল প্রবন্ধের সম্ভার দেখলেই চোখে পড়ে। প্রত্যেকটি ভাবনাই যে আলাদা এবং স্বতন্ত্র মাপের তা ভাবতে গিয়ে বড়ই বিস্ময় জাগে। তাঁর প্রবন্ধের বহুমুখিনতা, ব্যাপকতা আমরা পড়তে গিয়ে

বারবার লক্ষ্য করেছি। বক্তব্য গৌরব ও আদর্শ গম্ভীর প্রসঙ্গ এসে প্রবন্ধের শিল্পমূর্তিকে অধিকতর সুন্দর করেছে সমালোচক এমন কথাও মনে করেন -

> "রবীন্দ্র-প্রবন্ধের গদ্য 'গদ্যে'র প্রয়োজনাত্মক সীমা লঙ্ঘন করেই। শিল্প হয়ে উঠেছে। এই শিল্পরূপ সৃষ্টির জন্যই ভাষার মধ্যে এসেছে একটি অনন্যদুলর্ভ গুণ ভাষার পারিপাট্য ও শোভনভঙ্গি। তাঁর কোনো রচনাই, তাই হেলা ফেলার সৃষ্টি নয়, সযত্ন পারিপাটি করে লেখা, অর্থাৎ চেষ্টাকৃত 'প্রসাধন কলা' নয়, 'আন্তরিক সাধন বেগ' প্রাণের সহজ লাবণ্যের মতোই তা সহজ স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর।"[৯]

'কালান্তর' গ্রন্থের সংকলিত প্রবন্ধমালার প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় এগুলো বিভিন্ন সময়ে লিখিত হয়েছে। তেমন করে ধারাবাহিক কোনো রচনা নয়। স্বভাবই এর মধ্যে কবির সমাজ-রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ফসল হিসেবে এর বিষয় গৌরব কিছুটা আলাদা। প্রবন্ধগুলোতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ধারকে প্রাধান্য দিতে হয়। যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে লেখক যে ধরনের বলার ভঙ্গিকে উপস্থাপনা করেছেন তাঁর কথনরীতির মাধ্যমে, তাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার দিগন্তকে নতুন করে চিনতে ভুল হয় না। জটিল থেকে জটিলতর বিষয়কে কেবলমাত্র ভাবনার নিরিখে লেখা এবং লেখার এক আশ্চর্য যাদুদণ্ডে তাকে পাঠকের কাছে সহজ করে তুলেছেন। কোথাও গুরুগম্ভীর, কোথাও তত্ত্বভাবনা, আবার কখনও কখনও তথ্য ও তত্ত্বকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখার এক আশ্চর্য কৌশল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলোকে সজীব ও সতেজ করে রেখেছে। গ্রন্থের নামকরণ' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া যেতে পারে দু-একটা উদাহরণ -

> "একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখড়া বসত, আলাপ জমত পাড়া-পড়শিদের জুটিয়ে, আলোচনার বিষয় ছিল গ্রামের সীমার মধ্যেই বদ্ধ। পরস্পরকে নিয়ে রাগদ্বেষে গল্পে-গুজবে তাসে- পাশায় এবং তার সঙ্গে ঘণ্টা তিন-চার পরিমাণে দিবানিদ্রা মিশিয়ে দিনটা যেত কেটে। তার বাইরে মাঝে মাঝে চিত্তানুশীলনার যে আয়োজন হত সে ছিল যাত্রা সংকীর্তন কথকতা রামায়ণপাঠ পাঁচালি কবি গান নিয়ে। ...যে জগতের মধ্যে বাস সেটা সংকীর্ণ এবং অতিপরিচিত।"[১০]

রবীন্দ্রনাথের ভাবনার জগত যে কেবল করিত্বের জগতে নয়, তা ছড়িয়ে আছে বিপুল প্রবন্ধাবলীর মধ্যে নিবিড়পাঠে তা যেন বারবার পরিস্ফুট হয়। ভাবনার গভীরতায় পৌঁছে গিয়ে বাঙালি গ্রামীণ জীবনাচরণ সম্পর্কে প্রাবন্ধিক যে কত স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা বজায় রেখেছিলেন- তা তাঁর লেখায় ও ভাবনায় স্বচ্ছ- স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। জগত ও জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি মিশে গিয়ে যে বোধকে তিনি আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন তাই যেন তার কলমে উঠে এসেছে। লেখকের অসংখ্য রচনায় তার প্রমাণ মেলে। মানবতাবাদের পূজারী রবীন্দ্রনাথকে সবসময়ই মানুষের পাশে দাঁড়াতে দেখি। হোত স্বদেশ কিংবা দেশের বাইরের ঘটনা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে তাকে বিচার করার এক আদর্শ বিচারকও ছিলেন তিনি। তাই তাকেও বলতে শুনি অন্য এক প্রসঙ্গে -

> "য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোকে যে-সব দেশ উজ্জ্বলতম করে জ্বালিয়েছে, তাদের মধ্যে স্থান নিতে জার্মানি। কিন্তু আজ সেখানে সভ্যতার সকল আদর্শ টুকরো টুকরো করে দিয়ে এমন অকস্মাৎ এত সহজে উন্মত্ত দানবিকতা সমস্ত দেশকে অধিকার করে নিয়ে এও তো অসম্ভব হল না। যুদ্ধ পরবর্তীকালীন য়ুরোপের বর্বর নির্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদ্ঘাটিত হতে থাকল তখন এ কথাই বার বার মনে আসে, কোথায় রইল, মানুষের সেই দরবার, যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছাবে আজ। মনুষ্যত্বের পরে বিশ্বাস কী ভাঙতে হবে? বর্বরতা দিয়েই। কী চিরকাল ঠেকাতে হবে বর্বরতা।"[১১]

নেই কোনো ভনিতা, কিংবা কথার রকমারিতে কাব্য বিষয়কে জটিল না করে, মূল বিষয়টিকে কত স্পষ্ট ও ঋজুভাবে বলা যেতে পারে তার কথাই এখানে সহজভাবে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কথনশৈলী সবসময়ই যে সহজ সরল তা কিন্তু নয়, ভাবনার জটিল থেকে জটিলতার বিষয়গুলোকেও তিনি নিয়ে আসতে পারেন– ঠিক তাঁর মতো করে। এরকম উদাহরণ রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ বহুবার -

> "যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ

> বলেই মানুষের যে মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কী সে দেশকে বাঁচাতে পারে?"[১২]

এ ভাবনারই বিবর্তন দেখা যায়– 'সত্যের আহ্বান', 'চরকা', 'সমাস্যা' নামক নিবন্ধে লক্ষ্য করা গেছে প্রাবন্ধিক তার ভাবনাগুলোকে কোথাও একই পথে চালনা করেননি। যখনই প্রয়োজন এসেছে তখনই ভাবনার দিকগুলোকে নানাভাবে প্রসারিত করেছেন। বিশেষত সাহিত্যতত্ত্বের গুরুগম্ভীর বিষয়গুলোতে যখন ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করেছেন - তখনই আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে – 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'সাহিত্যের স্বরূপ' নামক অমূল্য রচনাগুলো। সবগুলোই যেন নিজস্ব মাপকাটিতে এক হয়েও যেন আলাদা। পড়তে গিয়ে দেখতে পাই কতই না তার গভীরতা ও ব্যাপকতা। ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধে সাহিত্যের আলোচনাকে তিনি কত ভাবেই যে ঋদ্ধ করেছেন তা পড়তে গিয়ে সহজেই বোঝা যায় -

> "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস - সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশের মতো নীরব হইয়াথাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব...।"[১৩]

কিংবা,

> "সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জানায়; অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবাস্তবকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া, বড়োকে বড়ো করিয়া, ফাঁককে ভরাট করিয়া, আলগাকে জমাট করিয়া দাঁড় করায়। প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায় সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে; সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়; সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।"[১৪]

আলোচনার সূত্র ধরে সাহিত্য নামক বিরাট মহীরূহকে রবীন্দ্রনাথ কতটুকু যত্ন করে লালিত করতেন, নানান লেখায় ও ভাবনায় এ কথাগুলো উঠে এসেছে। সাহিত্য যে কেবলই সাধারণ হেলাফেলার বিষয় নয়, তার নির্দিষ্ট একটি স্বতন্ত্র ও শ্রদ্ধার জায়গা আছে – রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যে তারই যেন ইংগিত মেলে। সাহিত্য বিচার করতে গেলে সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি এবং তাহা সঠিক ভাবে ব্যক্ত হয়েছে কতটা তাও ভাবতে হবে। চিত্র ও সংগীত যে সাহিত্যের ভাষার অনন্য পরিপূরক বিশেষ করে ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তাও রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। 'সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র' — একথা সবদিনই লেখক তাঁর রচনায় ব্যঞ্জিত করেছেন। আত্মগত ভাবোচ্ছাস সাহিত্যের যে সবকিছু তা কবি কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মত ছিল – 'সাহিত্য ব্যক্তি বিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দেববাণী।' সাহিত্যের নিত্য নতুন ভাবনা সম্পর্কে কবির ব্যক্তিক অনুভূতি আমরা পেয়েছি 'সৌন্দর্যবোধ', 'বিশ্বসাহিত্য', সৌন্দর্য ও সাহিত্য', 'সাহিত্য সৃষ্টি', 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য', 'সাহিত্যের প্রাণ', 'কাব্য', ও 'সাহিত্যের গৌরব' নামক নানান নিবন্ধগুলোতে।

'সাহিত্যের পথে' নামক রচনায় অন্য আরেক রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ধরা পড়েছে। সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে লেখকের পরীক্ষা নিরীক্ষা দীর্ঘদিনের। ফলে এই দীর্ঘ পরীক্ষার ফসলকে আমরা পাই এই গ্রন্থে। এখানেও রবীন্দ্রনাথ নতুন কথাকে নতুন ভাবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার আলোকে রচনার যে নব নব কৌশল তাও যেন আমরা লেখকের লেখার মধ্যে পেয়ে থাকি। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এমন কথা -

> "বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান। এই জানার থেকে নিজের ব্যক্তিত্বকে সরিয়ে রাখার সাধনাই বিজ্ঞানের। মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য; তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক, কিছুই আসে যায় না। এমনকি সেই অদ্ভুতের, সেই অতথ্যের উপলব্ধি যদি নিবিড় হয় তবে সাহিত্যে তাকেই সত্য বলে স্বীকার করে নেবে। ..."[১৫]

বিজ্ঞানের সাধনা ও মনুষ্যত্বের চাষ যে কোনো ভাবেই এক নয়, তা কোনোভাবে মেলা যে সম্ভবও নয় তা প্রাবন্ধিকের কথায় কর্মে বারংবারই প্রমাণিত হয়েছে। মূলত সৌন্দর্য সৃষ্টিই যে সাহিত্যের কাজ ও সেবা; সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোথাও আপোস করেননি। সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রাবন্ধিক আপনার প্রিয় জিনিসকে সব থেকে কাছে রাখতে আগ্রহী কেননা– তার মধ্যে সত্য নিহিত আছে। মানুষ প্রিয়কে সবদিনই আপন করতে চায়, কেননা তার সুন্দর ও সত্যের

সংমিশ্রণ হয়েছে বলেই। রস জীবন এবং জীবনবোধের উপলব্ধি সাহিত্যের মাঝে সবদিনই ছিল বলে মানুষ সাহিত্যের মধ্যে রসকে উপভোগ করে আনন্দ লাভ করতে চেয়েছে। প্রকৃতির বাস্তব ও সাহিত্যের বাস্তবের মধ্যে ফারাক বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিক যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন – তা 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের নিবন্ধ পাঠে সহজেই উঠে আসে। অনুরূপভাবে 'বাস্তব', 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য', 'সৃষ্টি', 'সাহিত্য ধর্ম', 'সাহিত্যতত্ত্ব', 'সাহিত্যরূপ', 'সাহিত্য সমালোচনা' নামক অসংখ্য প্রবন্ধাবলীকে কবিগুরুর বক্তব্যগুলো সরস ও আধুনিক যুক্তি সুলভ হয়ে উঠেছে। নিবিড় পাঠে তা আঁচ করা যায়। সাহিত্য এবং সাহিত্যতত্ত্বকে নিয়ে প্রাবন্ধিক যে কত আন্তরিক ছিলেন তাঁর লেখায় যেন তাই ধরা দেয়। 'আধুনিক সাহিত্য' নামক প্রবন্ধমালায় অন্য আরেক রবীন্দ্রনাথকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। আধুনিক মনোভাবনায় লেখক সবদিনই জাগ্রত থাকলেও এই প্রবন্ধমূলক গ্রন্থে এমন কিছু কিছু বিষয়ের অবতারণা করেছেন– যা সত্যিকার অর্থেই পাঠক মহলকে ভাবিয়ে রাখে। বিশেষত 'বঙ্কিমচন্দ্র', 'বিহারীলাল', 'সঞ্জীবচন্দ্র' সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন শুধু নয়, যে ধরনের ভাবনা ও শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করেছেন – তা আমাদের সত্যিকার অর্থেই ভাবিয়ে রাখে। ছোট্ট ও টুকরো কথায় প্রবন্ধকারের ক্ষোভ ও যন্ত্রণা যেমন বর্ষিত হয়েছে অন্যদিকে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বঙ্কিমের অবদানকে রবীন্দ্রনাথ আবারও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। লেখক জানিয়েছিলেন -

> "যে কালে বঙ্কিমের নবীনা প্রতিভা লক্ষ্মীরূপে সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া বাংলাদেশের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন তখনকার প্রাচীন লোকেরা বঙ্কিমের রচনাকে সসম্মান আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করেন নাই। সেদিন বঙ্কিমকে বিস্তর উপহাস বিদ্রূপ গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখক— সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণে বৃথা চেষ্টা করিত তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা গালি দিত। ...বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদপদ্ম সেই প্রথম উদঘাটিত হইল।"[১৬]

'সাহিত্যে কর্মযোগী'র কথা বঙ্কিম সম্পর্কে স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যে তাঁর ঋণ যে অপরিশোধ্য সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে 'বিহারীলাল', 'সঞ্জীবচন্দ্র' নিবন্ধে এই মানুষ দুটির স্থান যে স্বতন্ত্র তাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন। 'সঞ্জীবচন্দ্র' নিবন্ধে 'পালামৌ' গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই বিশাল প্রতিভাধর মানুষটির প্রতি 'গৃহিণীপনার অভাব লক্ষ করেও তাঁর প্রতিভার প্রতি রবীন্দ্রনাথ যথার্থ সম্মান জানিয়েছেন। অন্যদিকে 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক বিহারীলালকে যেমন বাংলা গীতিকবিতা উদগাতা বলেছেন বিপরীতে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাকে এক সমর্পিত প্রাণ বলেই স্বীকার করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের যতটা পাওয়ার কথা ছিল ঠিক ততটা পাননি। এই নিবন্ধ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রতি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন এরকমই কিছু কথা -

> "বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না। তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা অল্প ছিল এবং তাঁহার সুমধুর সংগীত নির্জনে নিভৃতে ধ্বনিত হইতে থাকিত, খ্যাতির প্রার্থনায় পাঠক এবং সমালোচক – সমাজের দ্বারবর্তী হইত না। কিন্তু যাহারা দৈবক্রমে এই বিজনবাসী ভাবনিমগ্ন কবির সংগীত কাকলিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছিল তাহাদের নিকটে আদরের অভাব ছিল না। তাহারা তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া জানিত।"[১৭]

বিনম্র শ্রদ্ধায় গীতিকবিতার বিপুলধারাকে মনে রেখেও রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তা তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য ছিল। অভিযানের সুর ধরে প্রবন্ধকারের বিনয় ছিল এ রকম –

> "সে প্রত্যুষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কুজিত হইয়া উঠে নাই। সেই ঊষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল সে সুর তাহার নিজের। ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।"[১৮]

এরই পথ ধরে রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ', 'কৃষ্ণগুরিত্র', 'মুসলমানের রাজত্ব' প্রভৃতি নিবন্ধগুলোকে 'আধুনিক সাহিত্য' নামক গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। 'চারিত্রপূজা' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যায় ভিন্ন আরেক রবীন্দ্রনাথকে। যেখানে প্রাবন্ধিক বাঙালি বিখ্যাত তিনজন মনীষীকে নিয়ে তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করেছেন। 'বিদ্যাসাগর-চরিত'; 'ভারত পথিক রামমোহন রায়'; 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' এর অবদান বাংলা সাহিত্যে যে কতটুকু তার পরিমাপ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-60
Website: https://tirj.org.in, Page No. 529-536
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাঁদের জীবনবৃত্তের যেমন পর্যালোচনা করেছেন অন্যদিকে বাঙালি ঐতিহ্যে প্রাতঃস্মরণীয় এই মানুষগুলোকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে কোনো মহাত্মাকে জোর করে মনের মধ্যে জাগরূক রাখবার প্রয়োজন হয় না। জীবনের কালচক্রে একমাত্র লব্ধ কৃতি যিনি বেঁচে থাকেন। মানুষের অতুল কীর্তি তার অপার বৈভব অপেক্ষাও উঁচুতে কালজয়ী নিশান উড়িয়ে দেয়। এই অর্থে 'কীর্তি যস্য সজীবতি' আমাদের প্রয়াস করে তাকে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন ভারতবর্ষে চরিতপূজা সত্যকার পথে চলেছে। এখানে কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে কেউ ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করে না। কিন্তু মোদীর দোকান থেকে আরম্ভ করে রাজসভা পর্যন্ত সর্বত্রই কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমান আদর। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগরের কঠিন পৌরুষময় জীবনাদর্শ চরিত্রটিকে যেমন মহৎ করে তোলে আমাদের মনে মহত্তর ভাবের উদ্রেক ঘটিয়েছে; তেমনি আবার রামমোহনের কীর্তি রামমোহনকে অমর করে রেখেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন – বিদ্যাসাগরের স্মরণকীর্তন হতে পারে তার চরিত্রাদর্শ দিয়ে কিন্তু - রামমোহনকে স্মরণ করতে হবে তাঁর কীর্তিকে অক্ষয় করে তুলতে চেয়ে। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন এরকম কথা-

> "তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে – তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বত প্রমাণে চরিত্র মাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথ এই পুরুষ শ্রেষ্ঠের অমল চরিত্র অক্ষয় মনুষ্যত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিদ্যাসাগর চরিত রচনা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বাঙালির জীবনবোধকে ভিতর থেকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। পর্বতের মত এই মানুষটি বিরাট শিল্প ধর্মে যেমন উজ্জ্বল ছিলেন, তেমনি ভাস্কর ছিলেন পুরুষ শ্রেষ্ঠের ব্যক্তিত্বেও। অন্যদিকে 'জীবনস্মৃতি' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ 'পিতৃদেব' নামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় যুক্ত করে তাঁর জীবনে এই মানুষটির অসীম প্রভাবের কথা ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। 'চারিত্রপূজায়' শ্রদ্ধেয় পিতৃদেব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বাল্যাবধি সেই শ্রদ্ধাবোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। পিতার চরিত্রে এমনকিছু মোহনীয় গুণের সমাবেশ রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন যা তাঁকে একসঙ্গে বিস্মিত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ করে তুলেছে। 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনে যে ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধির মধ্যে জীবন-যাপন করেছেন তাতে, মহর্ষি হয়ে ওঠা অপেক্ষা বিলাস-ব্যসনে গা-ভাসিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কবিগুরুর মতে – 'অমৃত পিপাসা ও অমৃত সন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রথম অন্তরায়।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ধনীগৃহের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও জগতকে দেখেছিলেন - ভগবত চিন্তার আলোকে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও দেবেন্দ্রনাথ আপনার অম্লান হৃদয়কে আজীবন অমৃতলোকের দিকেই প্রসারিত করে রেখেছিলেন। প্রাবন্ধিকের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে পিতার এই আচরণ, একই সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধে আপ্লুত হয়েছে হৃদয়। তাই পিতৃদেব সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শ্রদ্ধায় লিখছেন এমন কথা -

> "আমার পিতৃদেব স্বতন্ত্র ছিলেন, আমাদের স্বাতন্ত্র্যও তিনি শ্রদ্ধা করতেন। কোনদিন বাঁধতে চাননি। ...মুক্তির শিক্ষা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁর কাছেই শিখেছি যে, সত্যকে জোর করে দেওয়া যায় না; বহু বিরুদ্ধতার ভিতর অপেক্ষা করে থাকতে হয়।"[২০]

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ প্রবন্ধমালার ধারাকে সাধারণভাবে হলেও ছুঁয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। দীর্ঘসময় ধরে যিনি লালিত হয়েছেন তাঁর লিখনশৈলী ও কথামালার মধ্যে অনেক সময় সহজ কথা মনে হলেও – তার মধ্যে অনেক অনেক বিন্দুর উপস্থিতি প্রতিভাত হয়। প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধের জগত বিশাল ও ব্যাপক। একজন পড়ুয়া হিসেবে পড়তে গিয়ে ভাবনায় যেগুলো কথা উঠে এসেছে তাই এখানে উপস্থাপিত। তবে প্রবন্ধের জগত কী হতে পারে, কতভাবেই না বিস্তৃত হয়েছে নিবন্ধের আকাশ, সে শিক্ষাটাই যেন পাঠক আজীবন লাভ করবে রবীন্দ্রনিবন্ধে।

Reference :

১. ঘোষ, সুদক্ষিণা, রবীন্দ্র প্রবন্ধে সাহিত্যের নির্মাণশিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৩৯

২. তদেব, পূ ১৩৯-১৪০
৩. 'পুরানো জানিয়া চেওনা আমারে', গানের অন্তর্গত, অখণ্ড গীতবিতান (প্রেম), গীত সংখ্যা - ৭৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড, পত্র সংখ্যা - ১৭
৫. পাগল (বঙ্গদর্শন শ্রাবণ ১৩১১) বিচিত্র প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ, ভাদ্র, ১৩৪৮ সংখ্যা, পৃ. ৫৪০
৬. 'পথপ্রান্তে'; বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৩৪৮, বিশ্বভারতী, পৃ. ৩০
৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর, 'বাংলা সমালোচনা সাহিত্য', সময় সমাজ সাহিত্য, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, ১৪১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯১
৮. ঘোষ, সুদক্ষিণা, রবীন্দ্র প্রবন্ধে সাহিত্যের নির্মাণ শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৫৯
৯. তদেব, পৃ. ১৬০ - ১৬১
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কালান্তর', কালান্তর, বিশ্বভারতী, বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃ. ১১ - ১২
১১. তদেব, পূ ২৩-২৪
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক', কালান্তর, বিশ্বভারতী, বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃ. ৩২৪ - ৩২৫
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের সামগ্রী', সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩১৪, পৃ. ১৩ - ১৪
১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সাহিত্যের বিচারক, সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩১৪, পৃ. ২৫
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ভূমিকা', সাহিত্যের পথে, বিশ্বভারতী, আশ্বিন, ১৩৪৩, পৃ. ৭
১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বঙ্কিমচন্দ্র', আধুনিক সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩১৪, পৃ. ৭
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিহারীলাল', আধুনিক সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৩১৪, পৃ. ২৩
১৮. তদেব পৃ. ২৪
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিদ্যাসাগর চরিত', চারিত্রপূজা, বিশ্বভারতী, ১৩১৪, পৃ. ১৩
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা, বিশ্বভারতী, ১৩১৪, পৃ. ৯০

Bibliography :

আইয়ুব, আবু সয়ীদ : আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ১৯৬৮, কলকাতা।
আজাদ, হুমায়ুন : রবীন্দ্র প্রবন্ধ : রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তা, বাংলা একাডেমি, ১৯৭৩, ঢাকা।
দে, অপূর্ব কুমার : শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য, বামাপুস্তকালয়, ১৯৯৯, কলকাতা।
পাল নিমাইচন্দ্র : ছিন্নপত্র রবীন্দ্রজীবন কোষ, কেশব আড়ু, ১৯৯৮, ডিসেম্বর, কলকাতা।
ভট্টাচার্য তপোধীর: আধুনিকতা : পর্ব থেকে পর্বান্তর, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫ জুলাই, কলকাতা।
রায় অন্নদাশঙ্কর : শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ, বাণীশিল্প, ১৯৮৫ সেপ্টেম্বর, কলকাতা।
রায় দেবেশ : রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদিগদ্য, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮, কলকাতা।